ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 182-194
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.022

সংখ্যার উদ্ভব ও সংখ্যা পদ্ধতির বিবর্তন

মো. তাহমিদ রহমান, *প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, নূরুল আমিন মজুমদার ডিগ্রি কলেজ, লাকসাম, কুমিল্লা, বাংলাদেশ*

Received: 01.11.2024; Accepted: 26.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The history of the origin of numbers and number systems is a vast and interesting subject. Numbers are deeply connected with the progress of human civilization. Numbers have been an intregal part for calculation in every aspect of human society, from the earliest times to the present day. When the use of numbers actually began is a great mystery. The history of number systems, like the history of the development of human society, is a dynamic and continuous process. Egypt is the origin of numbers. According to anthropologists, human life originated about 2 million years ago. Along with the various geographical transformations of the earth in the course of time, people have also changed radically. Gradually human society started to live in groups in a community. The need for numbers in expression, calculation and various other fields arose right from the time when organized human societies started to become civilized. In order to meet the demands of daily life along with the development of civilization, people invented various number systems which have evolved over time. Numeral systems developed in Egyptian, Babylonian, Greek, Roman, Etruscans, Mayan, Cistercian civilizations differed in application and characteristics. These civilizations first attempted to interpret numbers through symbols or letters. The use of zero was absent from most number systems. Each civilization developed the concept of number system according to theirown needs. Chronologically, the Indian mathematician "Aryabhata" laid the foundations of the modern number system using zero (0) as a number. The invention and use of these ancient numerical systems have made an unimaginable contribution to the development of human civilization and the practice of knowledge. The invention of the modern number system which includes zero has revolutionized the field of calculation. The main purpose of this article is to discuss the history of numerology, the evolution of various ancient numerology systems that led to the foundation of the modern numeration system. I do strongly believe that will help us understand how numbers have become an integral part of human society.

Keywords: *Number, Civilization, numerical system, Society, symbols, Aryabhata.*

Number এর বাংলা প্রতিশব্দ 'সংখ্যা। সংখ্যার ব্যবহার যে আসলে কবে শুরু হয়েছিল সেটা একটা রহস্য। কে কোথায় কবে সংখ্যা আবিষ্কার করেছিল তা বলা মুশকিল। তবে ধারণা করা হয় আদিমানব নিজেদের

প্রয়োজনে গণনার চেষ্টা থেকে সংখ্যার আবিষ্কার করেছে। নৃতাত্ত্বিকদের মতে প্রায় ২০ লক্ষ বছর পূর্বে মানব জীবনের উৎপত্তি ঘটে। মানুষ তখন বসবাস করত বনে জঙ্গলে পাহাড়ের গুহায়। সভ্যতার ছোঁয়া থেকে মানুষ তখন ছিল দুরহস্ত। বন্যপ্রাণী ও গাছের ফলমুল ছিল মানুষের ক্ষুধা নিবারণের উপায়। আধুনিক সভ্য মানবের মত জীবন এত সহজ ছিল না। বৈরী আবহাওয়া ও বন্য হিংস্র জীবজন্তুর সাথে লড়াই করে টিকে থাকতে মানুষ হাতিয়ারের ব্যবহার শুরু করল। পাথর হলো মানব আবিষ্কৃত প্রথম হাতিয়ার। তাই নৃতাত্ত্বিকগণ সেই যুগকে পুরাতন প্রস্তর যুগ হিসেবে অভিহিত করে। সময়ের পরিক্রমায় বন্য মানুষের জীবনধারায় ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে ঘটে নানা বিবর্তন। ছয় লক্ষ বছর আগের বরফ আচ্ছাদিত পৃথিবী একসময় সবুজে ভরে উঠে। ঠিক সেই সময়কালে মানুষ পাথরে পাথর ঘষে আগুন জ্বালিয়ে ফেলে। পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি হয় এক নব অধ্যায়। এরপর থেকে হিংস্র জন্তুর হাত থেকে বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করে। চাহিদার কারণে মানুষ অপেক্ষাকৃত বড় পশু শিকার করা শুরু করে এবং আগুনে ঝলসে খেতে অভ্যস্ত হয়। দলবেঁধে শিকার করার প্রয়োজনে আস্তে আস্তে মানুষ ইশারা ও আওয়াজ করা শিখে। এভাবেই বন্য ও গুহাবাসী মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে পৃথিবীর বুকে কয়েক লক্ষ বছর অতিবাহিত করে ফেলে। সময়ের পরিক্রমায় পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক রূপান্তরের সাথে সাথে মানুষেরও পরিবর্তন হয়। নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের মতে প্রায় এক লক্ষ বছর আগে সর্বপ্রথম আফ্রিকায় বুদ্ধিমান মানুষের জন্ম হয়। আফ্রিকা থেকে এই বুদ্ধিমান মানুষেরা ইউরোপ, এশিয়া সহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পরে। প্রায় ৫০ হাজার বছর আগে এশিয়ার বেরিং প্রণালী হয়ে আফ্রিকানরা উত্তর আমেরিকায় পাড়ি জমায়। এই সকল অঞ্চল বরফে আচ্ছন্ন থাকায় মানুষের পদচিহ্ন রাখতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। কাল পরিক্রমায় উত্তর আমেরিকা থেকে মানুষ দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করে। আবার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দ্বীপসমূহ পাড়ি দিয়ে মানুষ অস্ট্রেলিয়ায় বসতি গড়ে তোলে। বরফাচ্ছন্ন যুগ পৃথিবীতে বহুদিন স্থায়ী ছিল এ সময় আদি মানুষ ইশারায় ভাব বিনিময় করত এবং দলবদ্ধ হয়ে শিকার করত। শিকারকে তারা ১,২,৩ ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রকাশ করত এর অধিক হলেই তারা অনেক হিসেবে অভিহিত করত। আস্তে আস্তে পৃথিবী উষ্ণ হতে থাকে এবং বরফ আচ্ছাদিত অঞ্চল গলে বিভিন্ন নদীর উদ্ভব হয়। নদীপথে পনি প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয় ফলশ্রুতিতে মানুষ নৌ পথে অভ্যস্ত হওয়া শুরু করে। নৌপথে চলতে গিয়ে দূর আকাশে রাতের চাঁদের গতিবিধি লক্ষ করে হয়তো মনের অজান্তেই সময়ের হিসাব শুরু করে। দূর আকাশের চাঁদের পরিবর্তন দেখে দেখে মানুষ একসময় বুঝতে পারে একটি পূর্ণচন্দ্র হতে সময় লাগে ৩০ দিন। ধারণা করা হয় এই প্রক্রিয়া অবলম্বনে করেই গড়ে উঠে প্রাচীন ট্যালি পদ্ধতি। পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ায় একসময় বরফ যুগের অবসান হলো আর আদি মানব পড়ল এক খাদ্য সংকটে। কারণ পশু শিকার করে চলত তাদের জীবনধারণ কিন্তু পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ায় বরফ যুগের সেই পশুও হারিয়ে গেল। ফলে আদিমানব ক্ষুধা নিবারণে নতুন করে নির্ভরশীল হওয়া শুরু করল বিভিন্ন ফল, লতা-পাতা, বীজ ও শস্যের উপর। আস্তে আস্তে মানব সমাজ দলবদ্ধ হয়ে বসবাস শুরু করলো এবং জীবনধারণে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ফল শস্য উৎপাদন করা শিখলো। বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি সৃষ্টি হল। বিভিন্ন বন জঙ্গল থেকে মানুষ শস্য ফলমূল সংগ্রহ করে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা শুরু করল এবং ফলশ্রুতিতে বসবাস ও জীবিকার সুবিধার কথা চিন্তা করে মানুষ স্থাযী জায়গায় অবস্থান করা শুরু করল। মানুষ বুঝতে শিখলো বিচ্ছিন্নভাবে থাকার চাইতে দলবদ্ধভাবে এক স্থানে অবস্থান করে বাস করা বেশি নিরাপদ ও জীবিকা নির্বাহ করা তুলনামূলকভাবে সহজ। আদি মানব জীবন যাপনের এই সময়কাল নৃতাত্ত্বিকদের ভাষায় প্রস্তর যুগ নামে অভিহিত। এভাবেই প্রাচীন মানুষ যখন সভ্য হওয়া শুরু করল অর্থাৎ যখন থেকে সভ্যতার বিবর্তন ঘটা শুরু করল ঠিক তখন থেকেই ভাব প্রকাশ, হিসাব-নিকাশ নানা ক্ষেত্রে সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। জন্মলগ্ন থেকে গণনার বিষয়টি তথা সংখ্যা পদ্ধতি এতোটা উন্নত ছিল না। মানুষ যখন স্থায়ীভাবে কৃষি কাজে

নিয়োজিত হলো, প্রয়োজনের তাগিদে তারা হাতিয়ার উন্নত করার দিকে মনোযোগ দিল। ফলশ্রুতিতে উৎপাদন বেড়ে গেল। খাবার পরে উদ্বৃত্ত শস্য হিসাব রাখার জন্য মাটিতে দাগ টেনে, কাঠি বা নুড়ি পাথর ব্যবহার করে অথবা দড়িতে গিট দিয়ে কিংবা আঙ্গুলের সাহায্যে হিসাব রাখা শুরু করল। বিজ্ঞানীদের ধারণা আজকে থেকে প্রায় বিশ হাজার বছর পূর্বে এভাবেই প্রথম মানুষ সংখ্যা দিয়ে গণনা শুরু করে। সভ্যতার শুরুতে মানুষের গণনার জন্য বড় বড় সংখ্যার প্রয়োজন হতো না। তাই এ সমস্ত পদ্ধতি সেই সময়কার গণনার যে কোন প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলতে পারতো। মনোবিজ্ঞানী জেয়ার্ড ডায়মন্ডের লেখা থেকে পাওয়া যায় নিউগিনির কিছু গ্রামে কেবল দুটি সংখ্যা প্রচলিত ছিল। তারা এক বুঝানোর জন্য আইয়া (iya) এবং দুই বুঝানোর জন্য রারিডো (rarido) ব্যবহার করত। কখনো চার ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে তারা বলতো রারিডো-রারিডো এবং পাঁচ বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা তো রারিডো-রারিডো- আইয়া। ধীরে ধীরে মানুষ বসবাসের সুবিধাজনক স্থানে নগর সভ্যতা গড়ে তুলল। সময়ের পরিক্রমায় বড় সংখ্যা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৪০০০ বছর আগে সুমেরীয় ও সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতার মানুষ মাটিতে দাগ টেনে বড় সংখ্যা হিসাব করার এক পদ্ধতি বের করে ফেলল। যা আজও আমাদের কাছে ট্যালি নামে পরিচিত। এই ট্যালি গণনার সংখ্যা পদ্ধতি পৃথিবীর বহু দেশে আজও প্রচলিত আছে। সাধারণত লোকসংখ্যা গণনা, গবাদি পশু গণনা, শস্য গণনার কাজে সুমেরিয় সভ্যতায় ট্যালি পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো। সুমেরীয় সভ্যতা মূলত গড়ে উঠেছিল নদীবেষ্টিত দেশ ইরাক ও এর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশীয় সুমের অঞ্চলে। এই অঞ্চলের মানুষজন ছবির সাহায্যে সংখ্যাকে প্রকাশ করা শুরু করে। এই সভ্যতাকেই আবার গ্রীকরা নামকরণ করেন মেসোপটেমিও সভ্যতা হিসেবে।বেলজিয়াম প্রত্নতত্ত্ববিদ জিন ডি হ্যানজেলিন ডি ব্রাউকোর্ট ১৯৬০ সালে আফ্রিকার কঙ্গোর ফিশারমেন সেটেলমেন্ট এর সেমলিকি নদীর তীরবর্তী এলাকায় বেবুনের হাজার বছরের পুরনো একটি হাঁড় খুঁজে পান। যাতে বেশ কিছু পরিকল্পিতভাবে খোদাই করা দাগ দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো দেখে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করেন যে দাগগুলো সংখ্যা গণনার হিসাব রাখার জন্য খোদাই করা হয়েছিল। এই হাঁড়টি ISHANGO BONES নামে পরিচিত যা সংখ্যা পদ্ধতির আদি নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই হাঁড়টি ২৫০০০ বছর আগের বলে দাবি করেন। বেঁবুনের এই হাঁড়টি দৈর্ঘ্য দশ সেন্টিমিটার, গারো বাদামী রঙের এই হাঁড়টির এক প্রান্তে কোয়ার্টসের একটি ধাঁরালো টুকরা লাগানো রয়েছে। অনেকেই এই হাঁড়ের খোঁদাই করা দাগগুলোকে ট্যালি চিহ্ন হিসেবে অভিহিত করেন। বিজ্ঞানীরা মনে করে হাঁড়টি চন্দ্রপঞ্জিকার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এটি হলো মানবজাতির প্রাচীনতম গাণিতিক হাতিয়ার।

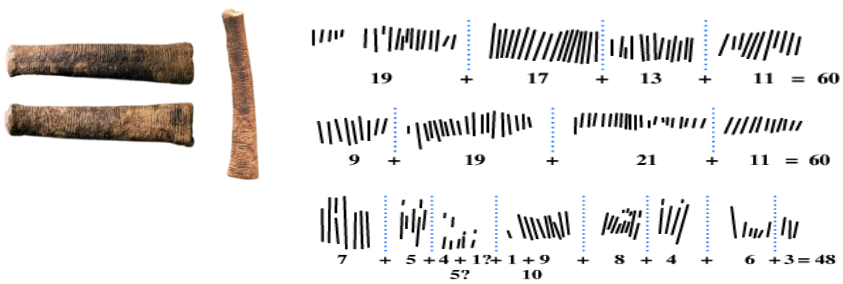

নিদর্শন এর চিহ্নসমূহের ব্যাখ্যা

Ishango Bones এর উপর অঙ্কিত ১৬৮ টি চিহ্ন বা দাগাঙ্কিত রেখা হারের দৈর্ঘ্য বরাবর তিনটি সমান্তরাল কলামে সাজানো। প্রতিটি কলামে দৈর্ঘ্য ও অভিযোজন ভিন্ন বিন্যাসে সজ্জিত করা। প্রথম কলামটি হাঁড়ের সবচেয়ে বাঁকাদিক বরাবর যা M কলাম নামে পরিচিত। বাম এবং ডান দিকের কলামগুলোকে যথাক্রমে G

এবং D নামে অভিহিত করা হয়। সমান্তরাল চিহ্নগুলি বিভিন্ন tantalizing অনুমানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ এগুলো দশমিক সংখ্যার ইঙ্গিত বহন করে। তবে অনেক গণিতবিদ অভিমত দেন যে এটি সহজতম কোন গাণিতিক সংখ্যা পদ্ধতি তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। হাড়ের আবিষ্কারক "জিন ডি হ্যানজেলিন ডি ব্রাউকোর্ট" চিহ্নগুলোকে সরল পাটিগণিতের প্রমাণক হিসেবে মত দেন। গণিতবিদ পিটার এস রুডম্যান ধারণা করেন সংখ্যাগুলো ৫০০ খ্রিস্টপূর্বে গ্রীক সময়কালের। গণিতবিদ ডার্ক হুইলব্রুক এর মতে ISHANGO BONES হল এমন একটি গণনাযন্ত্র যার বেস হলো ১২, সাববেস হলো ৩ এবং ৪। এটি দ্বারা সরল গুণের কাজ সম্পাদন করা হতো। নৃবিজ্ঞানী ক্যাডেল অ্যাভারেট হাঁড়ের অন্তদৃষ্টি ব্যাখ্যায় বলেন যে- চিহ্নের গ্রুপগুলিতে যে পরিমাণ সংখ্যা গুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলি স্পষ্ট প্রাগৈতিহাসিক সংখ্যার প্রমাণ। পূর্ণ সংখ্যার সংস্করণ ও হিন্দু- আরবীয় সংখ্যার বিকাশে অনবদ্য ভূমিকার জন্য ভারতীয় গণিতবিদ আর্যভট্টকে সংখ্যা পদ্ধতির জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়। গ্রীক দার্শনিক থেলস্ (Thales) সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংখ্যা প্রকাশ করেন। থেলস্-ই প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞান চর্চা শুরু করেন। প্রথম জীবনে থেলস্ একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, শেষ জীবনে জ্ঞান অর্জন এবং পরিভ্রমণের মাধ্যমে এই অর্থ তিনি ব্যয় করেন। মিশরে অবস্থান কালে ছায়ার সাহায্যে পিরামিডের উচ্চতা নির্ণয় করে সাধারনের প্রশংসা ভাজন হন। মানুষের ছায়া যখন তার দৈর্ঘ্যের সমান হয়, সেই সময় তিনি পিরামিডের ছায়া মেপে তার উচ্চতা নির্ণয় করেন। থেলস্ ই প্রথম ব্যক্তি যার নামের সাথে গণিত শাস্ত্রের বিভিন্ন আবিষ্কার জড়িত। প্রাচীনকালের সাতজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে থেলস্ একজন। তাকে গ্রীক জ্যোতিষশাস্ত্র, জ্যামিতি ও পাটিগণিতের জনক বলা হয়। সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাসে থেলস্ প্রবর্তিত চিন্তাধারা এক নতুন জ্ঞানের জগতের দ্বার উন্মোচিত করে। পূর্ণ সংখ্যার সংস্করণ ও হিন্দু- আরবীয় সংখ্যার বিকাশে অনবদ্য ভূমিকার জন্য ভারতীয় গণিতবিদ আর্যভট্টকে সংখ্যা পদ্ধতির জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়। সুমেরীয় সভ্যতার সময় আবিষ্কৃত ট্যালি পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা হলো বড় সংখ্যা যেমন: হাজার বা লক্ষের ঘরের সংখ্যা এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রকাশ করা যেত না। এই সমস্যা প্রথম অনুধাবন করেন মিশরীয় মানুষেরা। মিশরীয়রা চিন্তাধারায় যথেষ্ট উন্নত ছিল। মিশরীয়রা অনেক বড় বড় স্থাপনার কাজ করেছে। এ সকল স্থাপনার কাজ করতে গিয়ে তাদের বড় সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। মানব সভ্যতার বিকাশে মিশরীয়দের অবদান সবচেয়ে বেশি। কারণ মিশরীয় সভ্যতার ইতিহাস ও সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস পারস্পরিক অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। মিশরীয়দের বড় বড় স্থাপনা সমূহ নির্মাণের সময়ে হাজার হাজার শ্রমিকের খাবার ও নির্মাণ সামগ্রীর হিসাব রাখতে গিয়ে তারা সংখ্যা প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করত। ধারণা করা হয় মিশরীয়দের সংখ্যা পদ্ধতির সূচনা হয়েছিল পিরামিড নির্মাণেরও বহুবছর পূর্বে প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩৪০০ অব্দের দিকে। মিশরীয়দের দ্বারা প্রচলিত এসব লিখিত চিহ্নের নাম হায়ারোগ্লিফিক্স (Hieroglyphics). হায়ারোগ্লিফিক্স শব্দটি গ্রিক শব্দ হায়ারোগ্রিফোস থেকে এসেছে যার অর্থ পবিত্র লিপি। মিশরীয়দের হায়ারোগ্লিফিক্স লিপি মূলত চিত্রলিপি। প্রাচীন মিশরে তিন ধরনের চিত্রলিপি প্রচলিত ছিল। গ্রীকরা যখন মিশর দখল করে নেয় তখন তারা বিভিন্ন উপাসনালয়ের গায়ে এই লিপি দেখতে পায় তাই তারা এই লিপিকে পবিত্রলিপি মনে করে। উদ্ভবকাল থেকে বিলুপ্তকাল পর্যন্ত এই লিপি ছিল শব্দলিপি ও অক্ষরলিপি নির্ভর অক্ষরলিপি হিসেবে এখানে প্রায় ২৪ টি ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহার হলেও স্বরবর্ণের কোন অস্তিত্ব ছিল না খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০অব্দে মিশরীয়রা সর্বপ্রথম গণনা ছাড়াও পরিমাপের জন্য সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার শুরু করেন। এই পরিমাপের পদ্ধতিটি কিউবিট (CUBIT) নামে পরিচিত। এক কিউবিট হচ্ছে একজন মানুষের বাহুর দৈর্ঘ্য ও হাতের তালুর প্রস্থের যোগফলের সমান। এই এককটি তাদের কাছে খুবই পবিত্র ছিল যার ফলে তাঁরা এটার সমান করে একটি লাঠি কেঁটে তাদের ধর্মীয় উপাসনালয়ে সংরক্ষণ করত। এই মাপ দিয়েই তারা বিভিন্ন স্থাপনা যেমন: পিরামিড, মাস্তাবা, মন্দির ইত্যাদি তৈরি করত এবং এসব স্থাপনা

জ্যামিতিকভাবে খুবই নিখুঁত ছিল। মিশরীয়দের সংখ্যা ব্যবস্থা ছিল দশ ভিত্তিক। মিশরীয়রা হায়ারোগ্লিফিক্স পদ্ধতিতে একের জন্য একটি দাগ ব্যবহারের পাশাপাশি প্রতিটি পূর্ণ সংখ্যার জন্য আলাদা করে সংখ্যা ব্যবহার না করে দশ গুণোত্তর হারে প্রতিটি পূর্ণ সংখ্যার জন্য ভিন্ন প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করত। এই পদ্ধতিতে সংখ্যার কোন স্থানীয় মান ছিলনা। মিশরীয়দের এই পদ্ধতিটি আপাতত দৃষ্টিতে দুর্বোধ্য মনে হলেও সমসাময়িক কালে অনেক বড় বড় সংখ্যাকে সহজে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল।

এই পদ্ধতিতে সর্বনিম্ন সংখ্যা ছিল ১, যা দ্বারা প্রকাশ করা হতো এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ যা হাঁটু গেড়ে বসা একজন মানুষের ছবি দিয়ে প্রকাশ করা হতো। এই সংখ্যা পদ্ধতিতে শূন্যের কোন অস্তিত্ব ছিল না। হিসেবে ব্যালেন্স না থাকলে মিশরীয়রা 'নফর' ব্যবহার করত। 'নফর' কোনভাবেই গাণিতিক সংখ্যা শূন্য নয়। ভগ্নাংশ সংখ্যার প্রথম প্রবর্তন হয় মিশরে। এই পদ্ধতিতে স্থানীয় মানের কোন অস্তিত্ব ছিলনা।
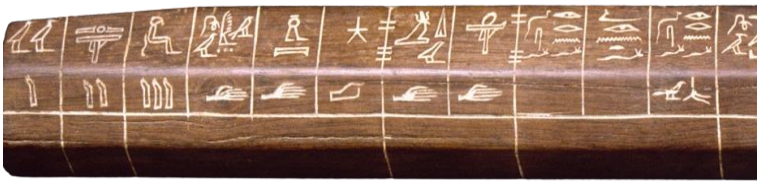
মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি (চিত্রলিপি)

ধরা যাক মিশরীয় পদ্ধতিতে আমরা ২০২৪ লিখতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের লিখার কোন উপায় ছিল না কারণ এই পদ্ধতিতে শূন্যের কোন অস্তিত্ব নেই কিন্তু যদি ২৩৭৮ লিখতে চাই তাহলে দুইটি ১০০০, তিনটি ১০০, সাতটি ১০ এবং আটটি ১ এর চিহ্ন বা প্রতীক পাশাপাশি লিখে প্রকাশ করতে হবে। ফলে ২৩৭৮ সংখ্যার প্রাচীন মিশরীয় রূপটি হবে নিম্নরূপ:

মিশরীয়দের এই সংখ্যা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে পিথাগোরাস কেবলমাত্র গণিতের উপর আলাদা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় পিথাগোরাস সর্বপ্রথম জোড় বিজোড় সংখ্যার ধারণা প্রবর্তন করেন। তাই পিথাগোরাসকে বলা হয় পৃথিবীর প্রথম তত্ত্বীয় গণিতবিদ। পিথাগোরাস কখনোই শূন্য ব্যবহারের অনুমোদন করেননি এ বিষয়ে তিনি এবং তার অনুচরেরা অত্যন্ত কঠোর ভূমিকা পালন করেন। মিশরের পার্শ্ববর্তী প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ নগরী ব্যাবিলন। বর্তমান ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। পাটিগণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যাবিলনীয়দের অগ্রগতি ছিল অভূতপূর্ব। যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজও আমাদের মাঝে বিদ্যমান। ব্যাবিলনীয়রা ষাটভিত্তিক (Sexesesimal) সংখ্যা পদ্ধতি উদ্ভব করে।

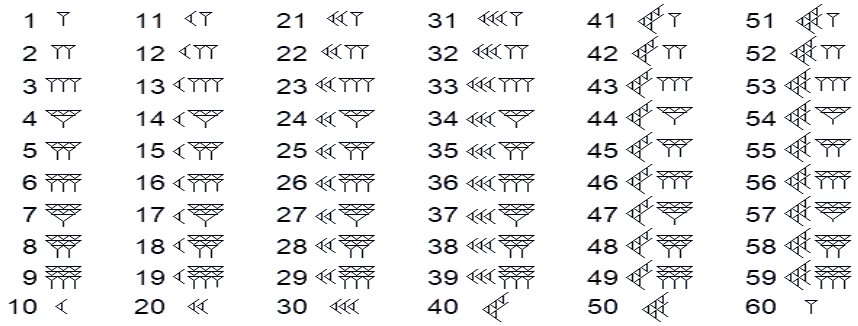

সেক্সেজেজিমাল বা ষাট ভিত্তিক এই সংখ্যা পদ্ধতি ষাট এর গুণিতক আকারে প্রকাশ করা হতো। এই সংখ্যা পদ্ধতি ছিল স্থানীয় সংখ্যা পদ্ধতি। বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রি কোণে বিভক্তকরণ, ৬০ সেকেন্ডে এক মিনিট, ৬০ মিনিটে ১ ঘন্টা, ১২ ঘন্টায় একদিনে প্রচলন করেছিল মূলত ব্যাবিলনীয়রাই। ব্যাবিলনীয়দের ১ মিনিট ছিল বর্তমানে প্রচলিত ২ মিনিটের সমান। তবে ব্যাবিলনীয়দের অর্জিত জ্ঞানের বেশিরভাগই কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেলেও মৃৎপাত্রে অঙ্কিত ও পাথরের ফলকে খোদাই করা লেখা থেকে জানা যায় ব্যাবিলনীয়রা পিথাগোরাসের উপপাদ্য ও দ্বিপদী উপপাদ্য সম্পর্কে অবগত ছিল। মিশরীয়দের মতো ব্যাবিলনীয়রাও শূন্যের ব্যবহার জানতো না। ষাটমূলক সংখ্যা পদ্ধতি উপর্যুক্ত চিহ্নগুলো ছাড়াও তারা আরো বেশ কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করত। এখানে একটি প্রশ্ন সবার মনে চলে আসতে পারে সেটা হল ব্যাবিলনের ষাট প্রীতির কারণ কি? এর সরাসরি উপযুক্ত উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে এর সাথে অনেকগুলো সম্পর্কযুক্ত বিষয় জড়িয়ে আছে। প্রথমত ৬০ হচ্ছে এমন একটি সংখ্যা যেটি ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৫, ২০ এবং ৩০ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। তাই ভগ্নাংশ সংক্রান্ত কোনো সমস্যার সমাধানের ৬০ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সংখ্যা। মনেকরি একটি কৃষি উৎপাদনে ৩ জন কৃষক অংশগ্রহণ করল। তারা এমন ভাবে চুক্তি করল যে মোট উৎপাদনের প্রত্যেকে যথাক্রমে মোট লাভের ১/২, ১/৩ এবং ১/৬ অংশ পাবে। তাহলে যদি ৬০একক ফসল উৎপাদন হয় প্রথম জন পাবে ৩০একক দ্বিতীয়জন পাবে ২০ একক এবং তৃতীয় জন পাবে ১০ একক। অর্থাৎ লাভ যত টাকাই হোক না কেন সেটাকে যদি ৬০ এর গুণিতক আকারে প্রকাশ করা হয় তাহলে হিসাবটা বেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায়। যদি উৎপাদন শেষে হিসাব করে দেখা যায় খরচ অবশিষ্ট এক হাজার টাকা লাভ হয়েছে। তাহলে ভগ্নাংশ ব্যতিরেকে লভ্যাংশ বন্টন করতে হলে (১৬*৬০+40=1000); প্রথমজন পাবে ৩০টাকার ১৬ গুণ এবং অবশিষ্ট ৪০ টাকার অর্ধেক অর্থাৎ ৫০০ টাকা। দ্বিতীয় জন পাবে ২০ টাকার ১৬ গুণ এবং প্রথম অবশিষ্ট টাকা বিতরণের পর যে টাকা অবশিষ্ট থাকবে সেখান থেকে তৃতীয় জনের দ্বিগুণ টাকা পাবে দ্বিতীয় জন অর্থাৎ ১৩ টাকা; দ্বিতীয় জন মোট পাবে ৩১৩ টাকা। অবশিষ্ট ১৮৭ টাকা পাবে তৃতীয় জন। এভাবেই খুব সহজে কোন ভগ্নাংশ ছাড়াই নির্ভুল বন্টন সম্ভব। এখানে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে আমাদের মত চমৎকার গুণ ভাগ করার পদ্ধতি সে সময়ের জানা ছিল না। বর্তমানে আমরা যে দশমিক পদ্ধতি ব্যবহার করি সেটা আবিষ্কৃত হয়েছে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার আরও ৩০০০ - ৩৫০০ বছর পরে ভারতবর্ষে। এছাড়া ব্যাবিলনীয়রা এক সৌর বৎসরের দৈর্ঘ্য হিসাব করেছিল ৩৬০ দিন, যেটার প্রকৃত দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। আবার ব্যাবিলনীয়রা একদিন হিসাব করত ১২ ঘণ্টায়। বিজ্ঞানীদের মতে এসব কারণেই ব্যাবিলনীয়রা ষাটমূলক পদ্ধতি বেছে নিয়েছিল।

ব্যাবিলনীয়দের খোদাই করা শিলালিপি

সমসাময়িক সময়ে ব্যাবিলনীয়দের পাশাপাশি সুমেরু, মেসোপটেমিয়া, অ্যাসিরিয়র বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন একটি লিপির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যা কিউনিফর্ম নামে পরিচিত। বাংলায় এই লিপিকে বলা হয় কিলকাকৃতি লিপি। এই লিপিতে সংখ্যা প্রকাশের জন্য বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করা হতো। এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রথম যোগ ও গুনের পাশাপাশি বিয়োগের ধারণা বিকাশ লাভ করে। এই লিপির মৌলিক অংক সমূহ ছিল ১, ১০, ১০০ এবং ১০০০। এর বাইরে অন্য কিছু প্রকাশ করা হতো যোগ, গুণ কিংবা বিয়োগ করে। যেমন: ১২ লিখতে ১০ এর সাথে দুটি ১ চিহ্ন যোগ করা হতো আবার ৮ প্রকাশ করতে ১০ এর সাথে দুইটি ১ চিহ্ন বিয়োগ করা হতো। প্রাচীন যুগে এই লিপি অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সুমেরীয় ও আক্কাদিয়ান বাদে অ্যাসিরিয়ান, ব্যাবিলনিয়ান, হাত্তিক, হুররিয়ান, উরাতিয়ান,হিট্টাইট,লুউইয়ান ভাষাও এই লিপিতে লেখা হয়। মিশর ছিল উর্বর ভূখণ্ড এবং এর অধিবাসীরা ছিল মূলত কৃষিজীবী। কিন্তু মিশরের পার্শ্ববর্তী গ্রিসের মূল ভূখণ্ড ছিল পর্বতময় ও অনেকাংশ অনুর্বর। মিশরীয়রা কৃষিকাজ করে উৎপাদন করতো এবং ঈশ্বরবাদী ধর্মে বিশ্বাসী ছিল অপরদিকে ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে গ্রিকরা যুদ্ধবিদ্যা পারদর্শিতা লাভ করে। মিশরীয় সভ্যতা ক্রমেই নতুনত্বহীন হয়ে পড়ে এবং ধর্মীয় রক্ষণশীলতা সমাজ বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশকারী যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী গ্রীকরা সহজে মিশর দখল করে। পৃথিবীর ইতিহাসে গ্রিকদের সভ্যতার আকস্মিক উত্থান অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং এর কারণ ব্যাখ্যা করা দুরূহ। বিশুদ্ধ বৌদ্ধিক শিল্প ও সাহিত্যকলায় গ্রিকদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণিত,বিজ্ঞান ও দর্শনে যে উপাদানসমূহ মিশর ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় অনুপস্থিত ছিল গ্রিক সভ্যতা সে সকল ক্ষেত্রে পূর্ণতা আনয়ন করেন। গ্রীকরা মিশর থেকে গণিত এবং ব্যাবিলনীয়দের থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞান লাভ করেছে ঠিক কিন্তু সমতল জ্যামিতির মৌলিক নিয়মগুলো তাদের নিজস্ব কৃতিত্ব। মিশরীয়রা যে জ্যামিতির বিকাশ সাধন করে তা বিজ্ঞানসম্মত ছিল না কিন্তু গ্রিকরা বিজ্ঞানসম্মত জ্যামিতির বিকাশ ঘটায়। গ্রিক দার্শনিক ও গণিতবিদ আর্কিমিডিস সংখ্যা পদ্ধতি কে নিয়ে যান এক অনন্য উচ্চতায়। পিথাগোরাস ও আর্কিমিডিসের হাতে জ্যামিতির প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়। এরিস্টটল সর্বপ্রথম অসীমের ধারণা প্রচলন করেন। ব্যাবিলন ও মিসরের মত গ্রিকরাও শূন্যের ব্যবহার করত না। এর বড় কারণ গ্রিক সংখ্যাব্যবস্থা পুরোপুরি ব্যাবিলনীয় ও মিশর দ্বারা প্রভাবিত ছিল। গ্রীকরা সংখ্যার জন্য আলাদা কোন প্রতীক উদ্ভাবন করেনি বরং গ্রীক বর্ণমালার অক্ষরের সাহায্যে তারা সংখ্যা প্রকাশ করতো। গ্রীকরা ব্যাবিলনীয় এবং মিশরীয়দের সংখ্যা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে দশ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি গড়ে তুলেছিল।

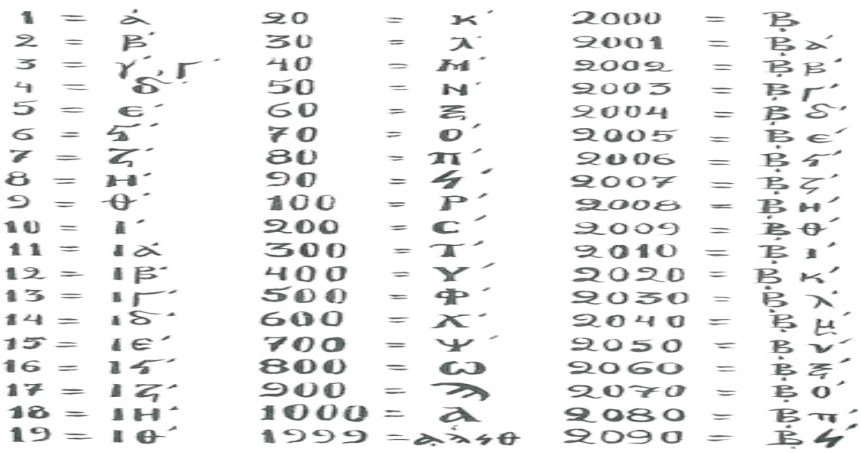

প্রাচীনগ্রিক সংখ্যা পদ্ধতির তালিকা

উপর্যুক্ত সারণি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ল্যাম্বডা দ্বারা বুঝানো হতো ৩০ কারণ ল্যাম্বডা এর অবস্থান তিন নম্বর সারিতে এবং ১০এর কলামে। বিটা দ্বারা বুঝানো হতো ২। তাই গ্রিক পদ্ধতিতে ৩২ লিখতে হলে আমাদের লিখতে হতো ল্যাম্বডা বিটা। কিন্তু সমস্যা হল সারণি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১ থেকে ৯০০ পর্যন্ত লিখতেই গ্রীকরা ৩৬টি আলাদা আলাদা অক্ষর ব্যবহার করত। অনুরূপভাবে এক লক্ষ পর্যন্ত লিখতে ৪৬ টি আলাদা অক্ষর ১০ লক্ষ পর্যন্ত লিখতে ৫৫ টি আলাদা অক্ষর এবং এক কোটি পর্যন্ত লিখতে ৬৪ টি আলাদা আলাদা অক্ষর ব্যবহার করতে হতো। আধুনিক পদ্ধতিতে আমরা পৃথিবীর সকল সংখ্যাকেই শূন্য(০) থেকে নয় (৯)এই দশটি প্রতীকের সাহায্যে লিখতে পারি। গ্রিক সংখ্যা পদ্ধতির এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর মনে রাখা একদিকে যেমন দুষ্কর অন্যদিকে তাদের যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ করাও কষ্টসাধ্য। গ্রীক সংখ্যা পদ্ধতির অন্যতম নিদর্শন হলো ১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বের দুইটি প্যাপিরাস যাতে পাটিগণিত জ্যামিতির নানা সমস্যা ও সমাধান লিপিবদ্ধ আছে। পঞ্জিকা গণনাতেও তারা গণিতভিত্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ব্যবহার করত গণিতের হর্ষদ ও ড্যামলো সংখ্যার উদ্ভব ও বিকাশ ও তাদের দ্বারাই হয়। ১৩শ শতাব্দীতে লিসেস্টারের আর্চডিকন জন অব বেসিংস্টোকের দ্বারা সিস্টেরিয়ান সংখ্যা পদ্ধতি নামে আরও একটি বুদ্ধিমান সংখ্যা পদ্ধতি চালু করা হয়। এই সংখ্যা পদ্ধতিটি মূলত প্রাচীন গ্রীক সংখ্যা পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। জন বেসিংস্টোক একজন গ্রীক পন্ডিত ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সিস্টারিকান সন্ন্যাসীদের মধ্যে গ্রিক বৃত্তি ছড়িয়ে দিতে। এর ফলে ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে পর্তুগাল থেকে পোল্যান্ড এবং ইতালি থেকে সুইডেন পর্যন্ত মঠগুলোতে এই পদ্ধতি বিস্তৃতি লাভ করে। জন বেসিংস্টোক প্রথমে এর সাহায্যে ১থেকে ৯৯পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে প্রকাশ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে এটি দ্রুত ৯৯৯৯ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ David A King একই ধরনের আরও একটি সংখ্যা পদ্ধতি ফ্রান্সের নর্ম্যান্ডিতে খুঁজে পান। সমসাময়িক সময়ে রোমান সংখ্যা প্রভাব বিস্তার করলেও খ্রিস্টান সন্ন্যাসীরা সিস্টেরিয়ান সংখ্যা পদ্ধতিটিকেই ধরে রেখেছিলেন। রোমান সংখ্যার চাইতে এই সংখ্যা পদ্ধতি তাদের কাছে জনপ্রিয় হওয়ার একটি কারণও ছিল আর তা হলো এই পদ্ধতিতে কোন সংখ্যাকে কেবল একটি প্রতীক দিয়ে লেখা যেত। তবে এই পদ্ধতির বড় দুর্বলতা হলো গুণ ভাগ করা যেত না। এই সংখ্যা পদ্ধতিতে একক বর্ণনাক্রমিক দশটি প্রতীক ব্যবহার করা হতো।

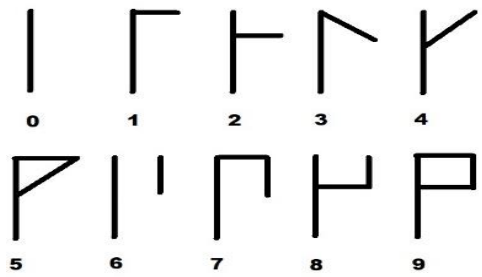

সিস্টেরিয়ান সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীক

এই সংখ্যাগুলোকে সহজ গাণিতিক গণনার জন্য ব্যবহার করা হতো না এর পরিবর্তে তারিখ, পান্ডুলিপীর পৃষ্ঠা সংখ্যা, পাঠ্যের বিভাজন, নোটের সংখ্যা, তালিকা, এমনকি হাইড্রোলিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে জড়িত নোটেশনের জন্যেও ব্যবহার করা হতো। সন্ন্যাসীরা মঠগুলোতে এই সংখ্যা পদ্ধতি এতো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিল যে স্থানীয় জনগণ তাদের প্রচলিত সংখ্যাগুলোতে অনেক পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়। ১৮ শতক পর্যন্ত ওয়াইন ব্যারেলের সংখ্যা এবং সেই ব্যারেলে ওয়াইনের পরিমাপ করার জন্য এই সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো। বর্তমান গণিতের ত্রিকোণমিতিতে ব্যবহৃত (চতুর্থাংশ)পদ্ধতির Cisterian

number system এ খ্রিস্টান ক্রসের উপর ভিত্তি করে চারটি চতুর্ভুজ রয়েছে। প্রতিটি চিহ্ন যেকোনো ১-৪ সংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। এসিস্টেন্ট টি ব্যবহার করার জন্য প্রচলিত নয়টি প্রতীক আত্মস্থ থাকতে হবে। ONES চতুর্থাংশে ব্যবহৃত হতো (১-৯) এর জন্য. TENS চতুর্থাংশে ব্যবহৃত হতো (১০-৯০) এর জন্য, HUNDREDS চতুর্থাংশে ব্যবহৃত হতো (১০০-৯০০) এর জন্য,THOUSANDS চতুর্থংশে ব্যবহৃত হতো (১০০০-৯০০০) এর জন্য । সাইফার (চিহ্ন) এর সাহায্যে লক্ষ লক্ষ, বিলিয়ন, ট্রিলিয়ন চিত্রিত করার জন্য কয়েক শতাব্দি ধরে অনেক প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। এলোমেলো সিস্টারসিয়ান সংখ্যাগুলিকে মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসীরা স্বরলিপি পদ্ধতিতে চিত্রিত করে। সমস্ত প্রতীকগুলো একটি একক আনুভূমিক চিহ্ন ব্যবহার করে তৈরি করা হয় কিন্তু পরবর্তীতে ১৪ ও ১৫ তম শতকে উলম্ব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেহেতু এই চিহ্নগুলো ক্রুশের মতো দেখায় তাই সন্ন্যাসীদের কাছে সিস্টারসিয়ান চিহ্ন গুলো ত্রাণকর্তার রূপক হিসেবে পরিগণিত হতো। সময়ের পরিক্রমায় ইন্দো-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি যখন হাতে লেখা পান্ডুলিপি থেকে ছাপানো বইয়ে স্থানান্তরিত হয় এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে রোমান সংখ্যার প্রভাব বিস্তার লাভ করে, খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের জনপ্রিয় এই সিস্টারসিয়ান পদ্ধতি সভ্যতার অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ১৯৯১ সালের লন্ডন ভিত্তিক নিলাম প্রতিষ্ঠান 'ক্রিস্টিজ' সিস্টারসিয়ান সংখ্যা পদ্ধতির একটি খোদাই করা সাইফার গ্লিফ সমষ্টির সন্ধান লাভ করে। গ্রিসের সভ্যতার অবসানের আগেই খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ইতালিতে পাহাড় বেষ্টিত টাইসর নদীর তীরে একটি বিশাল সম্রাজ্য ও সভ্যতা গড়ে ওঠে যা রোমান সভ্যতা নামে পরিচিত। রোমান সভ্যতার ব্যাপ্তি প্রায় দুই হাজার বছর। যুদ্ধবিগ্রহে আগ্রহী রোমানরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক জাতি হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের চাইতে শরীর চর্চা, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা হওয়ার দিকে বেশি মনোযোগী ছিল। বিভিন্ন সামরিক কলাকৌশল গ্রহণ করে নিজেদেরকে সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী করে গড়ে তুলত। যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে আগ্রহী রোমানরা যখন গ্রিসের 'সিরাকাস' দখল করতে গিয়ে আর্কিমিডিস কে হত্যা করল এরপর থেকে গণিতের উন্নতি রোমানদের দখলে চলে গেল। রোমানদের আলাদা একটি সংখ্যা পদ্ধতি ছিল যদিও সেটা বহুলভাবে প্রচলিত ছিল না। খ্রিস্টপূর্ব ৩৪০০ অব্দে রোমানরা তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহারের মাধ্যমে রোমান সংখ্যা পদ্ধতি চালু করে। রোমানদের দ্বারা প্রচলিত এই সংখ্যা পদ্ধতিটি ইউরোপীয়রা প্রায় ১৮০০ বছর ধরে ব্যবহার করে আসছে। ভৌগলিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে রোমান সংখ্যা পদ্ধতি সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সংখ্যা পদ্ধতি যখন হিন্দু- আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় তখন তা আরো কার্যকর রূপে প্রভাব বিস্তার লাভ করে। রোমান সংখ্যা পদ্ধতিতে সহজে যোগ,বিয়োগ করা গেলেও অন্যান্য গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ অনুপস্থিত ছিল। এই পদ্ধতিতে ভগ্নাংশ ও শূন্যের কোন অস্তিত্ব ছিলনা। রোমানরা তাদের সংখ্যা পদ্ধতির বেশিরভাগ চিহ্ন গ্রহণ করেছিল গ্রীক থেকে কিন্তু প্রচলিত জীবন ব্যবস্থায় রোমানরা গ্রীকদের থেকে ভিন্ন ছিল। যেমন: সংখ্যাতত্ত্ব, জ্যামিতি ও গণিতের অন্যান্য বিমূর্ত বিষয়গুলো নিয়ে রোমানরা উদাসীন ছিল। রোমানরা মূলত সংখ্যাকে সরলীকরণ করে জীবন উপযোগী গণিতের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিল। গুণ ও ভাগের ক্রিয়া-কলাপকে পাশ কাটিয়ে রোমানরা অ্যাবাকাসের মত গণনা বোর্ড ব্যবহার করত। অর্থাৎ গণিতের কার্যকারিতাকে রোমানরা মারাত্মক আকারে সীমিত করে আনে। এই কারণে অনেক গণিতবিদ রোমানদের এই সময়কে গণিতের অন্ধকার যুগ হিসেবে অভিহিত করে।পণ্য বিনিময়, ব্যবসা-বাণিজ্য ভৌগোলিক বিস্তৃতি ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ায় আধুনিক সংখ্যা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির পরও রোমান সংখ্যা গুলো বহু শতক পর আজও টিকে আছে। রোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং রোমান সংখ্যা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার কারণে ১৪ শতকে এসে রোমান সংখ্যা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে হিন্দু- আরবীয় সংখ্যা ব্যবস্থায় বিলীন হযে যায়। আধুনিক সংখ্যা ব্যবস্থায় রোমান সংখ্যাগুলি গণিতের প্রয়োজনীয় উপাদান না হলেও নান্দনিকতার শৈল্পিক বিচারে এগুলো এখনও কিছু কিছু

ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। বিভিন্ন সাম্রাজ্যের প্রকৃতপক্ষে ইন্দো-ইউরোপীয়, পশ্চিম এশিয়ার ককেশাস ও এশিয়ান অঞ্চলের সাথে ইহার অনেক মিল ছিল এবং এর শিকড় পশ্চিম এশিয়া থেকে পূর্ব-মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এট্রুস্ক্যান সংখ্যাগুলি রোমান সংখ্যার মতো একই শৈলীতে ব্যবহৃত হয়েছিল। চলমান আলোচনায় যে সকল সভ্যতার সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছি সেগুলো প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে কোন না কোন ভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল অথবা একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো মায়ান সভ্যতার সংখ্যা পদ্ধতি । মায়ান সভ্যতা হলো বিশ্বের অন্যতম কয়েকটি সভ্যতার মধ্যে একটি সভ্যতা যারা স্বতন্ত্রভাবে একটি স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি তৈরি করেছিল। কিন্তু অবাক করার বিষয় হল এই যে মাত্র ৫০০ বছর আগেও লাতিন আমেরিকার এই সভ্যতাটি সম্পর্কে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মানুষেরা অবগত ছিল না অথচ আজকে থেকে প্রায় ১৫ শত বছর পূর্বে মেক্সিকো ও আমেরিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ও আধুনিক মনা এই সভ্যতা উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করে। মায়ান সভ্যতা সম্পর্কে লোকোমুখে অনেক রহস্যময় কাহিনী প্রচলিত থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে মায়ান সভ্যতা পরিচিতি লাভ করে তাদের দিনপঞ্জিকার কারণে। অবাক করার বিষয় হলো মায়ান দিনপঞ্জিকায় ২০১২ খ্রিস্টাব্দের পর আর কোনো বর্ষ ছিল না। মায়ানরা বিশ্বাস করতো ২০১২ খ্রিস্টাব্দের পর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। যদিও এই ধারণার সাথে অনেক গবেষক দ্বিমত পোষণ করেছেন। এতকিছুর পরও সকল গবেষক এই বিষয়ে একমত যে মায়ান সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল স্বতন্ত্র ভাবে। প্রাক কলম্বিয়ান মায়ান সভ্যতার মায়ান সংখ্যা পদ্ধতিটি গণনার জন্য Vigesimal সিস্টেম ব্যবহার করেছিল। এই সংখ্যাপদ্ধতি মূলত ছিল ২০ এবং পাঁচ ভিত্তিক অবস্থানিক এক ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতিতে দশের পরিবর্তে ২০ এর উপর ভিত্তি করে এর সকল গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হতো। আমাদের প্রচলিত গাণিতিক সিস্টেমে ১,১০,১০০, এবং ১০০০ এর পরিবর্তে মায়ান সংখ্যা পদ্ধতিতে ১,২০,৪০০, ৮০০০ এবং ১৬০,০০০ ব্যবহার করা হতো। এর চাইতেও অবাক করার বিষয় হলো যে মায়ানরা শূন্যের জন্য আলাদা প্রতীক ব্যবহার করত। ০,১ ও ৫ এই তিনটি সংখ্যার জন্য তারা শুধু আলাদা প্রতীক ব্যবহার করত। সেদিক থেকে চিন্তা করলে মায়ানরা আধুনিক সংখ্যা পদ্ধতির খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। তবে যোগ, বিয়োগ সহ অন্যান্য গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি খুব একটা সুবিধার ছিল না। মায়ানরা লেখাকে দেবতার কাছ থেকে পাওয়া একটি পবিত্র উপহার বলে মনে করত। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি এক প্রকার অভিজাত শ্রেণি দ্বারা সংরক্ষিত ছিল বলে সাধারণ মায়ানরা লিখতে ও পড়তে পারতো না। অভিজাত শ্রেণি এই মর্মে বিশ্বাসী ছিল যে তারা সরাসরি দেবতাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। তারা মনে করত দেবতা ও সাধারণ মানুষের মাঝে তারা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত লেখার পদ্ধতিটি আংশিকভাবে হায়ারোগ্লিফিক ছিল কারণ এটি অক্ষরের পরিবর্তে পরিসংখ্যান ব্যবহার করতো। সিলেবল এবং আইডিওগ্রামের ধ্বনিগত প্রতীকগুলোর সংমিশ্রনে তৈরি করা হয়েছিল মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতির লিপিগত পাঠোদ্ধার করা অত্যন্ত জটিল ও দূরহ কাজ। স্প্যানিশ যাজকদের আদেশে তিনটি ব্যতীত অবশিষ্ট মায়ান কোডগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতির পাঠোদ্ধারে যে কোডগুলো এখনো সংরক্ষিত আছে সেগুলো হল ড্রেসডেন কোডেক্স,প্যারিস কোডেক্স এবং মাদ্রিদ কোডেক্স। মায়ানরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে অত্যন্ত দক্ষ ছিল এবং তাদের পর্যবেক্ষণ ছিল নির্ভুল। সমসাময়িক সভ্যতা গুলোর মধ্যে অন্যান্যদের চাইতে মায়ানরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। কোন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করেই তারা চাঁদ এবং গ্রহের গতিবিধির নির্ভুল পর্যবেক্ষণ করে দিতে পারতো। সৌর বছরের দৈর্ঘ্য পরিমাপে ইউরোপের তুলনায় মায়ান সভ্যতা বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতিতে গাণিতিক ক্রিয়া-কলাপের চাইতে সময় পরিমাপকে

বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এজন্য মায়ান সংখ্যা পদ্ধতির বেশিরভাগ নিদর্শন দিন, মাস এবং বছরের সাথে সম্পর্কিত দিনপঞ্জিকাতে পাওয়া যায়। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যাগুলিকে বিশের মধ্যে গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি যে তিনটি প্রতীক নিয়ে গঠিত তার মধ্যে প্রথমটি হলো একটি শেলসেপ যা দ্বারা শূন্য কে প্রকাশ করা হয়, দ্বিতীয়টি একটি বিন্দু(.) যা দ্বারা ১ কে প্রকাশ করা হয়, তৃতীয় প্রতীকটি একটি দন্ড বা বার(-) যা দ্বারা পাঁচ কে প্রকাশ করা হয়। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতির প্রতিটি স্তরে বিশটি বিন্দুতে পৌঁছাতে হয়। মায়ান সংখ্যা পদ্ধতিতে এক কে একটি বিন্দু দ্বারা, দুইকে দুটি বিন্দু দ্বারা ৩কে ৩টি বিন্দু দ্বারা, ৪কে চারটি বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা হয় পাঁচ প্রকাশের জন্য একটি আনুভূমিক বার চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। ১থেকে ১০০পর্যন্ত সংখ্যাগুলি মায়ান সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে বিন্দু চার বারের বেশি পুনরাবৃত্তি করা হয় না। ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত মায়ান সংখ্যাগুলিকে নিচে তালিকা করে উপস্থাপন করা হলো।

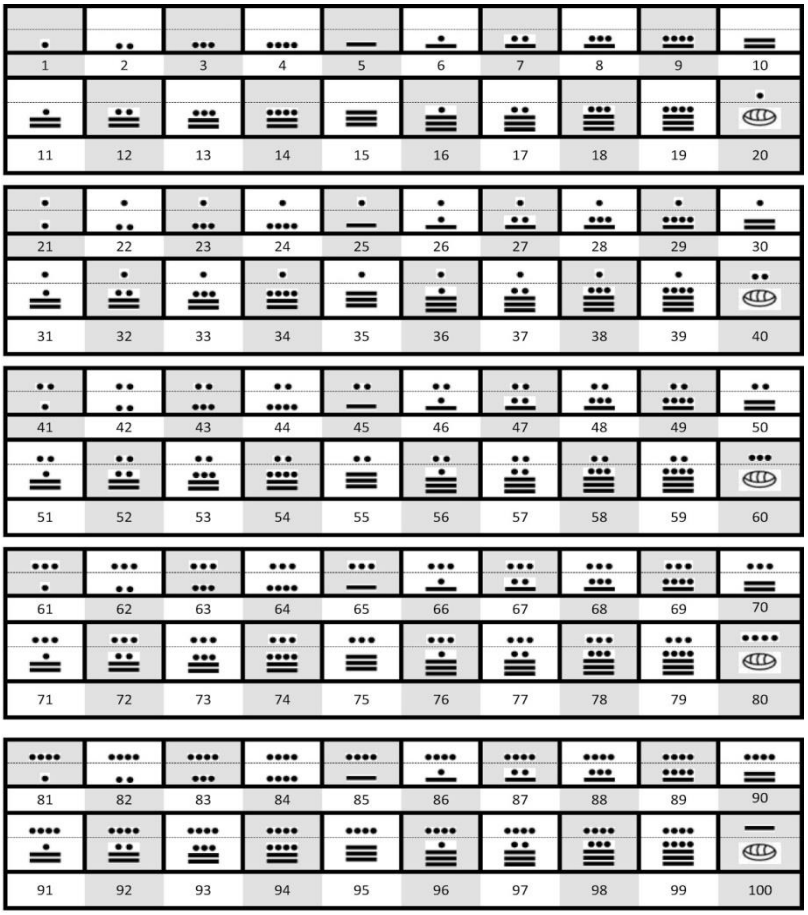

পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এর ভিতরে অনেক ধরনের সংখ্যা ব্যবস্থা আছে যেগুলো প্রায় বিলুপ্তির পথে এরকম কিছু সংখ্যা পদ্ধতি হলো নিউগিনির ওক্সাপমিন জনগোষ্ঠী সংখ্যার যে পদ্ধতি ব্যবহার করত তা ওক্সাপমিন সংখ্যা পদ্ধতি নামে পরিচিত। এই সংখ্যা পদ্ধতি ছিল ২৭ ভিত্তিক। মানবদেহের ২৭ অঙ্গের চিহ্ন থেকে তারা এ ২৭ ভিত্তিক সংখ্যা ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল। আফ্রিকার নাইজার - কঙ্গো এলাকার জনগোষ্ঠী তাদের ইয়োরুবা ভাষাতে যে সংখ্যা পদ্ধতি চালু করেছিল তা ইয়োরুবা সংখ্যা পদ্ধতি নামে পরিচিত। এই সংখ্যা পদ্ধতি ছিল ২০ ভিত্তিক। এই পদ্ধতির জটিলতা হল একই সাথে যোগ মূলক পদ্ধতির সাথে বিয়োগ মূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।পাপুয়া

নিউগিনির অধিবাসীগণ তাদের নিজস্ব ভাষায় এনডোমে যে সংখ্যা পদ্ধতি গড়ে তুলেছিল তা এনডোম সংখ্যা পদ্ধতির নামে পরিচিত। এই সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ছিল ৬। পাপুয়া নিউগিনিতে হুলি ভাষায় ১৫ ভিত্তিক একধরনের সংখ্যা পদ্ধতি চালু ছিল যা হুলি সংখ্যা পদ্ধতি নামে পরিচিত।মায়ান সভ্যতায় মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি ব্যতীত,২০ ভিত্তিক আরো এক ধরনের গণনা ব্যবস্থা চালু ছিল যা জটজিল সংখ্যা পদ্ধতি নামে পরিচিত । হাত ও পায়ের বিশটি আঙুল কে কেন্দ্র করে এই সংখ্যা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এসবের বাইরেও পৃথিবীর নানা অঞ্চলে নানা আঙ্গিকে বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধরনের এই সংখ্যা ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের জটিলতা ছিল ও গণনার বিভিন্ন ধরনের অভিনব কৌশল অবলম্বন করা হতো।সময়ের পরিক্রমায় সভ্যতা যখন আধুনিক রুপ লাভ করেছে আর সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে সংখ্যা পদ্ধতিরও উন্নতি ঘটেছে। মায়ান সভ্যতা যে সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিল সেখানে অনেক বড় সীমাবদ্ধতা হলো মায়ান দিনপঞ্জিকা। যেখানে ২০১২ এর পরে আর কোন বর্ষ সংখ্যার উপস্থিতি ছিল না অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করতো ২০১২ খ্রিস্টাব্দের পর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ ২০২৪খ্রিষ্টাব্দ কিন্তু পৃথিবী দিব্যি তার নিজ গতিতে চলমান। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যা পাওয়া যায় তা হল বর্তমানে যে পদ্ধতিতে আমরা সংখ্যা লিখি সেটা প্রাচীন ভারতীয় এবং আরবীয়দের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। আধুনিক এই সংখ্যা পদ্ধতিকে কেউ বলে ইন্দো-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি, কেউ বলে হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি। ভারতীয় গণিতবিদগণ প্রথম ও চতুর্থ শতাব্দীর মাঝে সমগ্র বিশ্বের সর্বাধিক প্রচলিত অবস্থানগত ১০ ভিত্তিক সংখ্যার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যা ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি নামে পরিচিত।শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত মোট দশটি গ্লিফের উপর ভিত্তি করে এই সংখ্যা পদ্ধতি গড়ে উঠেছে।এতদিন যাবত গণিতের অনেক সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার হলেও, কোন সংখ্যা পদ্ধতিতেই শূন্যের ব্যবহার রাখা হয়নি। শূন্যের কার্যকর ব্যবহার শুরু হয় ভারতীয় সভ্যতায়। পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোতে শূন্যের ব্যবহার ছিল না ঠিকই কিন্তু শূন্য সম্পর্কে ধারণা প্রচলিত ছিল। যেমন: মিশরীয়রা হিসেবে ব্যালেন্স না থাকলে শূন্য বা নফর দিয়ে তা প্রকাশ করত। ৬০০ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় গণিতবিদ আর্যভট্ট শূন্যকে সংকেত বা প্রতীক হিসেবে ব্যবহার না করে সংখ্যা হিসেবে সফলভাবে ব্যবহারের প্রথম কৃতিত্ব দেখান। ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্ত শূন্য এর ব্যবহার সম্পর্কিত নিয়ম কানুন 'Brahamasphuta Siddhanta' নামক বইয়ে প্রকাশ করেন। ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে শুরু হলেও, ৬০০খ্রিস্টাব্দের আগে এর লিপিবদ্ধ কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধর্মীয় প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আরবীয়দের যাতায়াত বহু পূর্ব থেকেই। আরবের প্রচলিত সংখ্যা পদ্ধতির চেয়ে ভারতে প্রচলিত সংখ্যা পদ্ধতির গাণিতিক হিসাব নিকাশ ছিল অনেক সহজ বোধ্য এবং কার্যকরী। দারুন এই সংখ্যা পদ্ধতিটি আরবদের মনে তাই খুব সহজে জায়গা করে নেয়। ভারতে শিখে যাওয়া এই সংখ্যা পদ্ধতিটি আরব সমগ্রবিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। নবম শতাব্দীতে 'আলখোয়ারিজমী' এবং 'আলকিন্দি' রচিত বই 'আরবীয়-গণিতে' ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতিটি গৃহীত হয়। এর পর থেকেই ইউরোপে হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে উঠে। আর এই জনপ্রিয়তার পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন 'লিওনার্দো দ্য পিসা' যার ডাকনাম ছিল 'ফিবোনাচ্চি'। তার নাম অনুসারে গণিতে আলাদা একটি অধ্যায় সৃষ্টি হয় যা ফিবোনাচ্চি ধারা নামে পরিচিত। ছন্দ প্রকরণে গণিতে ফিবোনাচ্চি ধারা প্রথম ব্যবহার করেন ভারতীয় গণিতবিদ পন্ডিত পিঙ্গলা।আধুনিক সংখ্যা ব্যবস্থা মূলত স্থানিক সংখ্যা ব্যবস্থা। যা আমাদের জীবন, বিজ্ঞান, শিক্ষা সহ রাষ্ট্রীয় সকল ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহৃত হয়। জীবন চলার প্রতিটি পদক্ষেপে সংখ্যার প্রয়োজন। সংখ্যা ব্যতীত জীবনে চলা কল্পনাতীত। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংখ্যা জড়িয়ে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনের কোণে নতুন ভাবনা উদয় করে যে, সংখ্যা পদ্ধতি আগামী বিশ্বকে কোথায় নিয়ে যাবে। আমরা যে দশটি অংক দ্বারা সংখ্যা গঠন করি সেগুলোকে শৃঙ্খলায়িত করা হয়েছে সুন্দর একটি পরিকল্পনায়। ১ থেকে ৯ পর্যন্ত অঙ্ক গুলোকে আমরা

৯টি সার্থক সংখ্যায় রূপান্তর করেছি। ৯ এর চেয়ে বড় সংখ্যাকে দুই বা দুই এর চেয়ে বেশি অংকের যোজনা দিয়ে লিখতে হয়। কয়েকটি অঙ্ক পাশাপাশি বসে যখন কোন মান প্রকাশ করে, তখন অঙ্ক গুলো তাদের নিজ নিজ অবস্থানের স্বকীয়তা বজায় রাখে যাকে স্থানীয় মান হিসেবে অভিহিত করা হয়। শূন্য(০) সহ দশটি অঙ্কের মাধ্যমে যোজনা দিয়ে সংখ্যা প্রকাশ করার এই নিয়ম ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতিতে উদ্ভব হয় এবং আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতির দ্বারা ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাই ইউরোপীয়রা একে হিন্দু-আরবীয় অংক পাতন প্রণালী নামে অভিহিত করে। প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদ ভাস্কর আচার্য তার কন্যাকে উৎসর্গকৃত পাটিগণিতের বই 'লীলাবতী'-তে সংখ্যার স্থানের নাম যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তা হল:

'একদশশতসহস্রযুত লক্ষ প্রযুত কোটাযঃ ক্রমশঃ
অর্বুদমজং খর্ব্ব নিখ মহাপদ্মশঙ্কবস্তস্মাতা।
জলধিশ্চান্ত্যংমধ্যং পরার্দ্ধমিতি দশগুনোত্তরাঃ সংজ্ঞাঃ।
সংখ্যায়াঃ স্থানানাং ব্যবহারার্থং কৃতাঃ পূর্ব্বৈঃ।'

সংখ্যা পদ্ধতির ক্রমবিবর্তনিক ইতিহাস প্রাচীন যুগ পেরিয়ে আজ পর্যন্ত এসেছে। ভবিষ্যতের সংখ্যা ব্যবস্থার চিত্র কেমন হতে যাচ্ছে সেই প্রশ্নই উদিত হোক তৃষ্ণার্ত মনে।

তথ্যসূত্র:

1) গণিত শাস্ত্রের ইতিহাস, কাজী মোতাহার হোসেন, প্রথম সংস্করণ: মাঘ,১৩৭৬, ঢাকা ।
2) উপমহাদেশে গনিতের ইতিহাস, ইতিহাসের গনিত, অভীক রায়, প্রথম প্রকাশ-২০২২, ঢাকা।
3) সংখ্যা, সেলিনা বাহার জামান, প্রথম প্রকাশ-২০০৭, ঢাকা
4) বিজ্ঞান চিন্তা, পত্রিকা, ঢাকা -১২ ফেব্রুয়ারি২০২০।
5) প্রথম আলো পত্রিকা, ঢাকা, ১০মে ২০২২
6) ব্যাপন, বিজ্ঞান পত্রিকা, বর্ষ০৯, সংখ্যা ০৪, ঢাকা।
7) দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা, ঢাকা, ১৮মে ২০২১ মুদ্রিত।
8) ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি, গান্তি প্রসাদা রাও, এপ্রিল ২০২৩, ভারত
9) প্রাচীন ভারতীয় গনিত ও জ্যোতির্বিদ্যা, সৌমেন সাহা, প্রথম প্রকাশ-২০১৪, ঢাকা।
10) দ্যা হিস্ট্রি অব নাম্বার সিস্টেম, গ্যাব্রিয়েল স্ম্যে,২০১৭, ইউএসএ।
11) Number Theory and It's History - By Oystein Ore
12) History of Ancient numeral system. By- Cassandra and Ala'a
13) www.luiss.edu
14) www.timeanddate.com
15) www.euemath.com